ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 533-540
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.241

স্বদেশিকতার আলোয় অমৃতলাল বসুর ‘সাবাস বাঙালী’

নগেন মুর্মু, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিধান চন্দ্র কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.12.2025; Accepted: 03.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In the context of the anti–Partition of Bengal movement of 1905, many Bengali writers portrayed the contemporary situation and expressed their protest through their literary creations. The Swadeshi Movement awakened the entire Bengali nation in a new way. There emerged an urge to rediscover everything that was beneficial and beautiful for the country. From everyday life to trade and commerce, a renewed love for indigenous products developed in support of the Swadeshi Movement. Through the boycott of foreign goods, efforts were made to weaken the economic foundation of British imperial power.

In the farce, we see that people from ordinary middle-class households, educated youths, and even village housewives came forward to produce Swadeshi goods. However, not the entire Bengali community opposed British rule. Some opportunists, who were employees of the British government and whose lives and livelihoods depended on it, refused to boycott foreign goods. They never supported the Swadeshi Movement. Playwright Amritalal Basu included characters from this class in his farce as well. Their mean mentality and opportunistic outlook evoke a sense of disdain in the minds of readers.

In the anti-Partition movement, the entire Bengali nation participated collectively. People from both Hindu and Muslim communities joined the movement in support of an undivided Bengal, the impact of which reached the vast shores of Bengali literature. The Swadeshi Movement found expression in various forms through songs, poems, short stories, novels, essays, and plays. Writers and artists chose their creative works as a language of protest. Alongside protest and the creation of public awareness, they also initiated revolutionaries into the mantra of freedom. Amritalal Basu’s farce *“Sabas Bangali”* is one such creation.

Keywords: Swadeshi Movement, patriots, loyalty to indigenous culture, morally degenerated Bengali, self-reliant Bengali, self-reliant India

বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্য গগনে যখন বিরাজমান ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমূখের মতো মহান নাট্যব্যক্তিত্ব, ঠিক সেই সময়ে আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)। নাট্যশিল্পে তাঁর প্রথম পরিচয় অভিনেতা হিসেবে। গিরিশচন্দ্র ঘোষের সান্নিধ্য পেয়ে নাটক সম্পর্কে অনেক খুঁটিনাটি জ্ঞান অর্জন করেন এবং পরবর্তীকালে নাট্যরচয়িতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষের ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠলেও নাটক ও প্রহসন রচনায় তাঁকে অনুসরণ করেননি। গিরিশচন্দ্র ঘোষ যেখানে সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় সমস্যাগুলিকে গুরুগম্ভীর ভাব ও ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন, সেখানে অমৃতলাল বসু একই বিষয়কে ফুটিয়ে তুলেছিলেন লঘু হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে। ব্যঙ্গনাটক

ও ব্যঙ্গপ্রহসন রচনাতেই তাঁর প্রতিভার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। এই কারণে তিনি 'রসরাজ' উপাধি পেয়েছিলেন। সমসাময়িক কাল ও সমাজকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তৎকালীন নানা সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অনাচার তার লেখনীর মধ্যে বারবার প্রকাশ পেয়েছিল। ব্রহ্মসমাজ, বিলেত ফেরৎ সভ্য বাঙালি সম্প্রদায়, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ, স্ত্রীস্বাধীনতার নামে ব্যভিচার, অলীক স্বদেশী আন্দোলন, কোনও কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায়নি। অমৃতলাল বসুর নাটক ও প্রহসনগুলি ব্যঙ্গাত্মক হলেও পাঠকের মনকে তীব্রভাবে আঘাত করেছে।

তাঁর লেখা প্রথম নাটক 'হীরক চূর্ণ'। বিষয় সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনা। বরোদা রাজ্যের ইংরেজ রেসিডেন্টকে হীরক চূর্ণ মিশ্রিত মদ্য পান করিয়ে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছিল মলহর রাজ গায়কোয়াড়ের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে রাজ্যচ্যুত ও নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘটনা নিয়েই রচিত 'হীরক চূর্ণ'। সাহিত্য সমালোচক ড. সুকুমার সেন অমৃতলাল বসুর সমগ্র নাট্যসৃষ্টিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন যথা-

১. বিশুদ্ধ প্রহসন- চোরের উপর বাটপাড়ি, তিল তর্পণ, ডিসমিস, চাটুজ্জে ও বাঁড়ুজ্যে, তাজ্জব ব্যাপার, রাজা বাহাদুর এবং কৃপণের ধন।

২. শিক্ষাত্মক প্রহসন- বিবাহ বিভ্রাট, সম্মতি সংকট, কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্রযাত্রা, একাকার এবং গ্রাম্য বিভ্রাট।

৩. বিদ্রূপাত্মক প্রহসন- বাবু, বৌমা, সাবাস আটাশ, অবতার, বাহবা বাতিক, সাবাস বাঙালী, ব্যাপিকা বিদায়, দ্বন্দে মাতনম্।

৪. চিত্রনাট্য- বিলাপ, বৈজয়ন্ত বাস।

৫. গীতিনাট্য- ব্রজলীলা, যাদুকরী।[১]

নাট্যকার অমৃতলাল বসু বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ছিলেন। এই আন্দোলন চলাকালীন তিনি বাঙালি জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লক্ষ্য করেছিলেন। কোথাও দেখেছেন চরিত্রের অসঙ্গতি, কোথাও বা সাহেবের চাটুকারিতায় মত্ত, অথবা দেখেছেন পণলোভী বা চাকুরীলোভী, আত্মসম্মানত্যাগী, ভণ্ড দেশহিতৈষী, এবং উপাধিলোলুপ বাঙালিকে। এই আদর্শভ্রষ্ট বাঙালি জাতিকে আত্মনির্ভর, শিক্ষিত, আদর্শবান এবং স্বদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। বাঙালি জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সাধনাকেই তিনি শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। 'সাবাস বাঙালী' প্রহসনে নাট্যকারের সেই উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়েছে। এটি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৬ সালের জানুয়ারি মাসে। গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ১৯০৫ সালে ২৫শে ডিসেম্বর 'স্টার থিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়েছিল। প্রহসনটি দুটি অঙ্কে গঠিত। প্রথম অঙ্কে ছয়টি এবং দ্বিতীয় অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য রয়েছে।[২] প্রহসনে কোনও একক কাহিনি নেই। তৎকালীন রাজনৈতিক চাপানোতরের ফলে যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল তার প্রভাব এখানে স্পষ্ট। আন্দোলনের ফলে বাঙালি সমাজের সর্বস্তরে যে পরিবর্তন ও প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল তারই প্রতিফলন এই প্রহসনে দেখা যায়। যুব সম্প্রদায়ের মনে দেশমাতৃকার প্রতি জাতীয়তাবোধ তৈরি করা এবং বিদেশি পণ্য বর্জন করে দেশীয় পণ্যের প্রতি বাঙালিদের ভালোবাসা পুনরায় ফিরিয়ে আনার কাহিনি রয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল যার বর্ননা রয়েছে 'সাবাস বাঙালী' প্রহসনে।

বঙ্গদেশে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ নীতিকে কেন্দ্র করে। উনবিংশ শতাব্দী থেকে ভারতীয়দের বিশেষ করে বাঙালি জাতির মনে পরাধীনতার গ্লানি এক অস্বস্তিকর মানসিক

পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতি ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করে আসছিল। এই বিরোধিতা কোথাও সশস্ত্র, কোথাও বা লেখনীর মধ্য দিয়ে ঝলসে উঠেছিল প্রতিবাদের লেলিহান শিখা। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সমগ্র বাঙালি জাতি একত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ অখন্ড বঙ্গদেশের সমর্থনে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, যার ঢেউ এসে পড়েছিল বাংলা সাহিত্যের বিস্তীর্ণ তটে। গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং নাটকে নানা রূপে স্বদেশী আন্দোলনের প্রসঙ্গ উঠে এসেছিল। সাহিত্যিক এবং বিভিন্ন শিল্পীরা প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে বেছে নিয়েছিল নিজেদের শিল্পকর্মকে। শুধু প্রতিবাদ এবং জনসচেতনতা নয়, তার পাশাপাশি বিপ্লবীদের স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। অমৃতলাল বসুর লেখা 'সাবাস বাঙালী' প্রহসন এমনই একটি সৃষ্টি।

এই প্রহসনে অমৃতলাল বসু একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বিশেষত আদর্শচ্যুত বাঙালিকে স্বনির্ভর ও আদর্শবান জাতিতে পরিণত করে এক স্বনির্ভর দেশ গড়তে চেয়েছিলেন। প্রহসনের প্রস্তাবনা অংশে আমরা দেখি অন্তঃপুর সংলগ্ন বাগানে মহিলাগনের গান। এই গানের মধ্যদিয়ে বিদেশি বস্ত্র, শিক্ষাব্যবস্থা, এবং আদব-কায়দাগুলিকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। হ্যাট, কোট পড়ে সাহেবিয়ানা দেখানোকে বাঁদর সাজ বলে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। অপরদিকে দেশি বস্ত্র অর্থাৎ ধুতি, চাদর পড়া বাঙালি যুবকদের বরণ ডালা নিয়ে উলুধ্বনি সহযোগে বরণ করা হয়েছে। নাট্যকার অমৃতলাল বসু শুরুতেই বিদেশি পণ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি সমস্ত কিছুকে বর্জন করে দেশীয় সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন যা স্বদেশী আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে। প্রহসনের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় এক গৃহস্থ বাঙালি পরিবারের কথা। পরিবারের কর্তা নয়ানচাঁদ ও তাঁর স্ত্রী গরবিনীর কথাবার্তায় উঠে আসে স্বদেশী আন্দোলনের আঁচ। আন্দোলনের প্রভাব কীভাবে বাঙালিদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করতে পেরেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় যখন নয়ানচাঁদ বলে, উচ্চশিক্ষা এবং ডিগ্রির পরিবর্তে দেশীয় পণ্য উৎপাদনে সক্ষম কারিগরের মূল্য বিয়ের বাজারে অনেক বেশি। মিটিং মিছিল করে সমস্ত বাঙালিদের মধ্যে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে। সমস্ত যুবক এখন পড়াশোনা শিখে ডিগ্রি অর্জন না করে, ব্যবসা-বাণিজ্য, কারিগরীবিদ্যা, নানারকম হাতের কাজ যেমন- কামার, কুমোর, ছুতোর এবং তাঁতির কাজ শিখে স্বনির্ভর হতে চাইছে।

প্রহসনের তৃতীয় দৃশ্যে কেন্দ্রীয় চরিত্র মতিলালের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হয়। স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য মতিলালকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সদ্য বি.এ পাস করার পর সে ব্যারিস্টারি নিয়ে পড়াশোনা করছে। বাবা মায়ের স্বপ্ন তাকে বিয়ে দিয়ে মোটা টাকা পণ হিসেবে ঘরে তুলবে। যেহেতু মতিলাল একজন শিক্ষিত যুবক সুতরাং পণের টাকার পরিমাণও নিশ্চয় বড়ই হবে, কিন্তু বাবা-মায়ের এই স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে। ঘটনাচক্রে সরকার বিরোধী আন্দোলনের জন্য মতিলালকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই তার বাবা-মা দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। পনের টাকা হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। ছেলে জামিন পেয়ে বাড়ি ফিরে এলে তাকে নানা উপায়ে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় সে যেন এই আন্দোলন, মিটিং, মিছিল থেকে দূরে থাকে, কারণ পুলিশের খাতায় একবার নাম উঠে গেলে বিয়ের বাজারে তার দাম অনেক কমে যাবে। কোনও ভদ্র ঘরের কন্যা সে পাবে না, পণের টাকা তো অনেক দূরের কথা। কিন্তু মতিলাল বিয়ে, সংসার এসব থেকে দূরে থাকতে চায়, স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে চায়। দেশ তার কাছে মায়ের সমতুল্য। দেশের মানুষ যেখানে কোম্পানির অত্যাচারে জর্জরিত, সেখানে সে কোম্পানির চাকরি নিয়ে তাদের গোলামী করতে পারবে না। তার বাবা অঘোরনাথ ব্রিটিশ কোম্পানির দোকানে বড়োবাবু। এই পদ নিয়ে অঘোরবাবু যতটা গর্ববোধ করে, তার ছেলে

মতিলাল ঠিক ততটাই ঘৃণার চোখে দেখে। কোম্পানির অধীন কাজ করাকে মতিলাল গোলামী বলে মনে করে। সে তার বাবাকে মাঝে মাঝে বলে-

> "ছেড়ে দাও বাবা চাকরি। আমাদের সুর বংশ কত বড় বংশ, আর সেই বংশে জন্মগ্রহণ কোরে তুমি কিনা একটা দর্জির দোকানে গোলামী করছো।"[৩]

মতিলাল আরো বলেছে-

> "হাত জোড় করে জিজ্ঞাসা করি, কেন আপনি চাকরি করেছিলেন? কেন ঠাকুরদাদা মহাশয়ের ঘোটনা পাড়ার ভিটে ছেড়ে, সেখানকার চাষবাস উঠিয়ে দিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন? ঠাকুমার মুখে তো গল্প শুনেছি, যে আমাদের দেশের বাড়িতে কত সুখ ছিল, কত লোক অন্ন খেতে যেতো, কত পালা-পার্বণ হোতো! আর এই কলকেতার ইংরিজি পোড়ে, দাসত্ব করতে শিখেই বা আমরা কত সুখেই আছি।"[৪]

মতিলালের এই কথা থেকেই বোঝা যায় দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি তার কতটা আনুগত্য রয়েছে। কোম্পানির শাসনব্যবস্থায় কেউ সুখী নয় তা স্পষ্ট। বাঙালি নিজের পরিচয়, ব্যক্তিত্ব, শিল্প-সংস্কৃতি সমস্ত কিছুকে বিসর্জন দিয়েছে সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে। কোম্পানির বশ্যতা স্বীকার করে দাসত্ব জীবনকেই অনেকে নিয়তি বলে মেনে নিয়েছিল। অথচ মতিলাল দেশের জন্য নিজের সুন্দর জীবন ত্যাগ করতে চেয়েছে, দেশের মানুষের পাশে থেকে তাদের জন্য কিছু করতে চেয়েছে। দেশহিতৈষী ভাবনা মতিলালকে আর সাধারণ বাঙালির থেকে উচ্চ উচ্চস্থানে নিয়ে গেছে। মতিলাল চরিত্রের মধ্যে এক বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। তার বাবা তাকে নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলে সে বলেছে- "আপনি তার জন্য কেন ভাবছেন, না হয় আমি দেশের জন্য দু'মাস জেল খাটলুম বা।" দেশের জন্য এই আত্মত্যাগ সত্যিই প্রশংসনীয়। বাবা-মায়ের প্রতি মতিলালের মন্তব্য থেকে স্বদেশচেতনার আরো পরিচয় আমরা পাই যেখানে সে বলেছে- "আমায় অনুমতি দিন যে- আমি উকিলির একজামিন দেব না। যাতে ভয়ে ভয়ে দেশের লোকে লোকে ঝগড়া বাড়ান যায়, সে ব্যবসা আমি কোরবো না। আমার ইচ্ছে হয়েছে, বিজ্ঞান শিখে শিল্পের উন্নতি কোরবো।" নাট্যকার অমৃতলাল বসু নিজে যেমন স্বদেশী আন্দোলন সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি তাঁর সৃষ্টি চরিত্র মতিলাল দেশের মানুষের জন্য সমস্ত সুখ ভোগ ত্যাগ করে দেশের যুবকদের মধ্যে স্বদেশচেতনার বীজমন্ত্র রোপন করতে চেয়েছে। দেশের প্রতিটি মানুষকে প্রথাগত শিক্ষার বাইরে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছে।

বিদেশি পণ্য বর্জন করে দেশীয় শিল্পের উন্নতি ঘটানো এটাই ছিল মতিলালের স্বপ্ন। সমাজের সর্বস্তরের মানুষদের স্বদেশী পণ্য ব্যবহার করতে উৎসাহ দিয়েছেন। প্রহসনের পঞ্চম দৃশ্যে স্বদেশী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একজন বাঙালি মেমসাহেব যখন ইংরেজদের দোকানে বিদেশি জামা কাপড় কিনতে আসে। সেই সময় মতিলাল ও তার কিছু সহপাঠী মেমসাহেবকে বিদেশি বস্ত্র কিনতে বাধা দেয়, তারা জানায় এই পণ্য কিনে কেন বিদেশিদের আর্থিকভাবে লাভবান করবেন, তার বদলে যদি দেশীয় বস্ত্র বা পণ্য কেনেন তাহলে কিছু দেশীয় ব্যবসায়ী লাভবান হবে এবং পরোক্ষভাবে দেশীয় শিল্পের অগ্রগতি ঘটবে। কিন্তু মেমসাহেব অর্থাৎ মিসেসগুপ্তা তাদের কথা মানতে চাননি তার স্পষ্ট বক্তব্য- "প্রতি মানুষ্যেরই স্বাধীন ইচ্ছা চালানোর ক্ষমতা আছে। আমার যা ইচ্ছে, আমার যা আবশ্যক সেই মতো আমি দ্রব্য সংগ্রহ করবো। তাতে কাহারও বাধা দেওয়ার অধিকার নেই।" কথাটার মধ্যে যুক্তি থাকলেও মতিলাল ও তার সহপাঠীরা সহজে হার মানে না। বিদেশি পণ্য বর্জনের মধ্য দিয়ে দেশ সেবার যে সংকল্প তারা নিয়েছে সেটা স্পষ্ট ভাবে তারা জানিয়ে দেয়-

> "আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি দেশীয় শিল্পের উন্নতির পক্ষে প্রাণপণে সাহায্য করবো, দেশের দাসত্বে জীবন উৎসর্গ করব।"[৫]

যুবকদের এই প্রতিজ্ঞার কাছে বাঙালি মেমসাহেব নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে এবং দেশভক্তি দেখানোর সুযোগ পেয়ে প্রতিজ্ঞা করে যে, কোনও দিন সে বিদেশি বস্ত্র বা পণ্য ব্যবহার করবে না এবং বাড়ির সবাইকে দেশীয় পণ্য ব্যবহার করতে উৎসাহিত করবে।

অমৃতলাল বসু শুধুমাত্র হিন্দু বাঙালিদের মধ্যে স্বদেশচেতনার প্রকাশ ঘটাননি। বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ও এ আন্দোলনে সামিল হয়েছিল, তার পরিচয় আমরা পাই প্রহসনের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে, যেখানে দেখা যায় কিছু যুবক একত্রিত হয়ে 'বন্দে মাতরম' শ্লোগান দিতে দিতে গরিব ও দুঃস্থ মানুষদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ করছিল। এমন সময় গোলাম উল্লাহ নামক এক মুসলমান সমাজপতি যুবকদের 'বন্দে মাতরম' শ্লোগান দিতে বাধা দেয় এবং নিজেকে সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে স্বদেশী আন্দোলনে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করে দেয়, সে জানায়-

> "আমি এই দেশের সমস্ত মুসলমানের পক্ষ হয়ে বলছি যে, এই স্বদেশী আন্দোলন মুসলমান সম্প্রদায়ের অভিপ্রেত নয়।"[৬]

অন্যদিকে আব্দুল শোভান একজন মুসলমান হয়েও হিন্দুদের স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন করেছে এবং হিন্দু মুসলমানদের পরস্পর ভাই ভাই বলে সম্মোধন করেছে। নিজে একজন জমিদার হয়েও সাধারণ হিন্দু প্রজাদের এক মাতার সন্তান ভেবে আলিঙ্গন করেছে। যুবকদের সঙ্গে নিয়ে 'বন্দে মাতরম' জয়ধ্বনি উচ্চারণ করতে দ্বিধা বোধ করেনি। মুসলমানদের মধ্যে গোলাম উল্লাহর মতো সুবিধাবাদী মানুষজন যেমন ছিল, তেমনি আব্দুল শোভানের মত পরোপকারী ও নিঃস্বার্থ মানুষেরও অভাব ছিল না। দেশভক্ত মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে আব্দুল শোভান এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রহসনের দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে নাট্যকার দেখিয়েছেন কীভাবে স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ এসে পড়েছে সাধারণ বাঙালি পরিবারের অন্তঃপুরে। পরিবারের গৃহকর্তীরা আস্তে আস্তে বিদেশি পণ্য বর্জন করে দেশীয় পণ্য ব্যবহারে আগ্রহী হয়েছে এবং এভাবেই আন্দোলনকারীদের হাত শক্ত করেছে। এই দৃশ্যে উল্লিখিত ভদ্রমহিলাগণ কামিনী, বিরাজ ও চারুবালা এদের পরস্পরের কথাবার্তায় উঠে আসে যুবকদের আত্মত্যাগের কথা। উচ্চশিক্ষিত ডিগ্রিধারী যুবকদল কোম্পানির অফিসে গোলামীর পরিবর্তে স্বনির্ভর হতে চেয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় দেশীয় বস্ত্র তৈরি করে দেশের অর্থনীতিকে শক্ত জায়গায় দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছে। এই বিপ্লবে তারা পাশে পেয়েছে সচেতন বাঙালি গৃহবধূদের। এতদিন যারা দামি দামি শৌখিন বিদেশি পণ্য ব্যবহার করত, তারাই এখন দেশীয় পণ্যের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। তারা বুঝতে পেরেছে বিদেশি পণ্য ক্রয় করা মানে সমস্ত অর্থ বিদেশীদের হাতে তুলে দেওয়া এবং দেশীয় শিল্পের অবক্ষয় ঘটানো। তাই বাঙালি পরিবারের সমস্ত নারীগণ প্রতিজ্ঞা করেছে তাঁতিদের সঙ্গে মিশে নিজেরাই দেশীয় বস্ত্র উৎপাদন করবে। নাট্যকার অমৃতলাল বসু জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালিদের নিয়ে এক স্বনির্ভর ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন।

গানে স্বদেশীকতা: 'সাবাস বাঙালী' প্রহসনে স্বদেশী গানের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। নাট্যকার অমৃতলাল বসু খুব সচেতন ভাবেই এই প্রহসনে স্বদেশ চেতনামূলক গান ব্যবহার করেছেন। নাট্য সাহিত্যের স্বদেশ চেতনামূলক গানের ব্যবহার ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে শুরু হয়েছিল। যদিও বাংলা সাহিত্যে গানের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই চর্যাপদের যুগ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। তখন ধর্ম ও সাংস্কৃতিক চেতনার মধ্যেই গানের বিষয় সীমাবদ্ধ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজদের আগমনের পরেই স্বদেশ চেতনার বিষয়টি প্রকাশিত হয়। ইংরেজ শাসনকালে দেশের মানুষের শোচনীয় দূরবস্থা, হীনমন্যতা এবং সর্বোপরি পরাধীনতার গ্লানি, স্বদেশী গান রচনার মূল অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে। পরাধীনতার অপমান থেকে নিজেদের মুক্তির অভিপ্রায়ে সকলকে একাত্ম ও জাগ্রত করার নানা পথের সন্ধান শুরু হয়। এই প্রহসনে গানের ব্যবহারের মধ্য

দিয়ে নাট্যকার স্বদেশ চেতনাকে শুধুমাত্র শিক্ষিত মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখলেন না, এই চিন্তা চেতনাকে দেশের সর্বশ্রেণির মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। হিন্দু মুসলমান ঐক্য ও সম্প্রীতির বিষয়টি উঠে আসে এই গানগুলির মধ্যে। প্রহসনের শুরুতেই প্রস্তাবনা অংশে বঙ্গের সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের মহিলাগণ গানের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির স্বজাত্যবোধ জাগ্রত করতে চেয়েছে। অন্তঃপুর সংলগ্ন উদ্যানে সমবেত হয়ে তারা মুক্তকণ্ঠে গান গেয়েছে-

"আজ শুভদিনে শুভক্ষণে মাথায় নিছি বরণ ডালা।
হোলো বাঙালী ফের বাঙালী উলু দেলো বঙ্গবালা।।
(ওই দেখ) তারা পোরেছে দিশি ধুতি চাদর,
হ্যাট কোটের আর নাই কো আদর,
(এবার) বাঁদর সাজা ঘুচে গেছে দেলো সবার গলায় মালা।"[৭]

গানের এই অংশের মধ্যে ফুটে উঠেছে বাঙালি জাতির পুনরায় বাঙালি হয়ে ওঠার কথা। ইংরেজ শাসনকালে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির বিপর্যয় লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও আদব-কায়দা আয়ত্ত করতে গিয়ে কিছু বাঙালি যুবক নিজেদের মহান ও উদার ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে ত্যাগ করেছিল। ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে গিয়ে খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, দৈনন্দিন জীবনের নানান সংস্কার পরিবর্তন করেছিল। বাঙালিয়ানা হারিয়ে যেতে বসেছিল। এই পরিবর্তন শুধু যুবকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ পরিবারের গৃহবধূরা পর্যন্ত সমাজে নিজেদের মেমসাহেব হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্য বাঙালিয়ানা ত্যাগ করেছিল। নাট্যকার অমৃতলাল বসু সেই হারিয়ে যাওয়া স্বজাত্যভিমান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে গেছেন। পুনরায় স্বদেশী পণ্য, স্বদেশী বস্ত্র এবং বাঙালি আদব-কায়দার প্রতি তাদের সম্মান ফিরিয়ে এনেছেন। তাই গানের মধ্যে আমরা দেখি বাঙালি যুবকরা যখন হ্যাট, কোট ছেড়ে আবার ধুতি, পাঞ্জাবি, চাদর পড়েছে তখন মহিলাগণ তাদের বরণ ডালা নিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে গলায় মালা পরিয়ে সবাইকে বরণ করতে চেয়েছে। এ যেন এক শুভক্ষণ, বাঙালি সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের মহেন্দ্রক্ষন। নাট্যকার শুধু বিদেশি পণ্যের বিরোধিতা করেননি, পাশ্চাত্য শিক্ষারও সমালোচনা করেছেন। যে শিক্ষা মানুষকে চাকরবৃত্তিতে পরিণত করে, সেই শিক্ষাকে ধিক্কার জানিয়েছেন। বি.এ, এম.এ এবং আইন পাস করে ইংরেজ সরকারের গোলামী করাকে ঘৃণা করেছেন। এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেশের জঞ্জাল জ্বালা বলে আখ্যায়িত করেছেন। গানের ভাষায়—

"ধিক ধিক ধিক বিএ, এমএ পাশ,
ডবল সেলাম দিয়ে গোলামীর আশ;
ধিক সে মামলা, ধিক সে সামলা, ধিক সে আমলা
দেশের জঞ্জাল জ্বালা।"[৮]

প্রথম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে একটা গানের উল্লেখ আছে যেখানে সমাজের সর্বনিম্নস্তরে বসবাসকারী মুচি শ্রেণির কথা বলা আছে। স্বদেশিকতার আবহে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সচেতন হয়ে উঠেছিল। বিদেশী পণ্যের পাশাপাশি ইংরেজ শাসক ও তৎকালীন বাবু শ্রেণির প্রতি তাদের ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে উক্ত গানে। গানের ভাষায়-

"বাবুদের জুতিটী ছিঁড়িয়ে গেলে কি হোবে।
এই মুচী বোলে ডাকলে হামায় কথাটী আর না কোবো।
বষ্টন, ডসন, ল্যাট্টিমার তাদের মুখে ঝাড়ু মার,
আরতো ও জুতিটী ভাই সিলাই কোরতে না লোবো।"[৯]

প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে জনতা চরিত্র মায়া-র কণ্ঠে একটি স্বদেশী গানের পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনা প্রসঙ্গে এই দৃশ্যে দেখা যায় মতিলাল কিছু ছাত্রদলের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিদেশি বস্ত্র পরিত্যাগ করে দেশীয় বস্ত্র ব্যবহারের জন্য মানুষদের সচেতন ও আগ্রহী করার কাজে উদ্যোগী হয়েছে। এমন সময় এক বাঙালি মেমসাহেব বিদেশি বস্ত্র ক্রয় করে বাড়ি ফিরছিলেন। ছাত্রদল ওই মেম সাহেবকে বিদেশি পণ্যের বদলে দেশীয় পণ্য ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করে। দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য তারা দেশের দাসত্ব জীবন উৎসর্গ করতে রাজি। ছাত্র সম্প্রদায়ের এই আত্মত্যাগ দেখে মেমসাহেব নিজের বিচারধারা পরিবর্তন করেন এবং দেশীয় বস্ত্র ব্যবহারে উদ্যোগী হয়ে দেশভক্তির পরিচয় দেন। ঠিক সেই মুহূর্তে মায়ার কণ্ঠে এই গান শুনতে পাওয়া যায়-

"ওগো তোরা আলো কর বঙ্গদেশের মুখ।
চেয়ে তোদের পানে আমার যেন বাড়ছে দশহাত বুক।।
ওরে আমার মায়ের বাচ্চা সব,শুনে তোদের 'মা মা' বোলে রব
কবো আর কেমন করে আমার মনে হচ্ছে কত সুখ।।
কিন্তু হাত ধরে মানা করি বাপ,পুণ্যের ভারতে আর এনো নাকো পাপ
নিজের কড়ি পুড়িয়ে দিয়ে আর বাড়িও নাকো দুখ।।"[১০]

দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যের শেষ অংশে চারুবালা ও অন্যান্য ভদ্রমহিলাদের মিলিত কণ্ঠে একটি গান শোনা যায়, যে গানের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে দেশের শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় বি.এ, এম.এ পাস করে ইংরেজ সরকারের চাকরি গ্রহণ করে গোলামি করার পরিবর্তে দেশীয় শিল্পের উন্নতির কাজে ব্রতী হয়েছে। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় মোট বয়ে নিয়ে ধুতি, শাড়ি বিক্রি করছে। দেশীয় বস্ত্র শিল্পের উন্নতির জন্য তারা প্রাণপণে পরিশ্রম করে চলেছে। তাদের এই পরিশ্রমকে কুর্নিশ জানিয়ে এবং তাদের উৎসাহিত করতে মহিলারা গান বেঁধেছে।

"দাদারা মোট নিয়েছে মাথায়।
বেড়ায় বেচে ধুতি সাড়ী সবাই কলকাতায়।।
ওমা কোরে তিন চারটে পাশ,
ছেড়ে উকিলী কি বড় চাকরীর আশ,
হোয়ে দেশের দশের দাস, এরা ফিরচে খাতায় খাতায়।।"[১১]

প্রহসনের একেবারে শেষ অংশে চন্ডীমন্ডপে মহিলাগনের চরকা কাটতে কাটতে একটা গানের উল্লেখ রয়েছে। সেই গানের মাধ্যমেই নাটকের যবনিকা পতন হয়েছে। গানে উঠে এসেছে সর্বশ্রেণির মানুষের বিশেষ করে মহিলাগনের স্বনির্ভর হয়ে ওঠার কথা। ইংরেজ শাসনের আগে বঙ্গদেশ স্বনির্ভর ছিল। দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় পণ্য দেশীয় পদ্ধতিতেই উৎপন্ন হতো। মানুষের জীবন-যাপন ছিল অতি সাধারণ। খাদ্য,বস্ত্র বাসস্থানের জন্য কোনও বিদেশি জাতির কাছে বা বিদেশি প্রযুক্তির কাছে নির্ভরশীল ছিল না। পুনরায় সেই স্বনির্ভর বাঙালি জাতি গড়তে, সর্বোপরি এক স্বনির্ভর দেশ গড়তে মহিলাগণ ডাক দিয়েছে এই গানের মধ্য দিয়ে-

"আমরা আবার কাটবো সুতো চরকাতে।
যাবনা আর সখী সেজে সভার মাঝে ফরকাতে।।
শুনেছি সেই ঠাকুর মা দিতেন নিজে ঢেঁকিতে পা,
পোড়তো নাকো এলিয়ে গতর কোনও কর্ম্ম করাতে।।
ঠাকুর পো ভাই বুঝিয়ে দিলে, প্রাণে প্রাণে গেল মিলে,

নিলে নিলে দেশের ধন, সব যাচ্চে পরের বরাতে।।
জ্যাকেট বডিস যাক উচ্ছন্ন, আমরা হবনা আর মতিচ্ছন্ন,
দেবো দেশের অন্ন কিসের জন্য বিদেশীর পেট ভরাতে।।
শুনছি এক আছে ছুতো, দেশে নাকি নাইকো সুতো,
আমরা ঘরে ঘরে কেটে সুতো দেবো তাঁতী তরাতে,
যদি বাবুরা হন লো নারাজ বিলিতী জুতা পরাতে।।"[১২]

গান ব্যবহারের মাধ্যমে নাট্যকার মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচনে গানগুলি যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রহসনের সূচনা ও পরিণতি গানের সার্থক প্রয়োগের মধ্য দিয়েই ঘটেছে।

উপসংহার: ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্যে বহু সাহিত্যিক নিজেদের সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে তৎকালীন পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন এবং প্রতিবাদ জানিয়েছেন। স্বদেশী আন্দোলন সমগ্র বাঙালি জাতিকে এক নতুন রূপে জাগিয়ে তুলেছিল। দেশের যা কিছু মঙ্গল, যা কিছু সুন্দর তাকে নতুন করে চিনে নেওয়ার তাগিদ দেখা দিয়েছিল। দৈনন্দিন জীবনকর্ম থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রেই স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থনে দেশীয় পণ্যের প্রতি নতুন ভাবে ভালোবাসা তৈরি হয়েছিল। বিদেশি পণ্য বর্জনের মধ্যদিয়ে ব্রিটিশ রাজশক্তির অর্থনীতিকে ভেঙে দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। প্রহসনে আমরা দেখি সাধারণ গৃহস্থ পরিবার থেকে শুরু করে শিক্ষিত যুবক এবং সর্বোপরি গ্রামের গৃহবধূরা পর্যন্ত স্বদেশী পণ্য উৎপাদনে এগিয়ে এসেছে। তবে সমগ্র বাঙালি জাতি ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করেছিল তা নয়, কিছু কিছু সুবিধাবাদী যারা ইংরেজ সরকারের কর্মচারী ছিল, যাদের জীবন ও জীবিকা নির্ভর করেছিল ব্রিটিশ সরকারের ওপর, তারা বিদেশি পণ্য বর্জনে অস্বীকার করেছিল। তারা স্বদেশী আন্দোলনকে কখনোই সমর্থন করেনি। নাট্যকার অমৃতলাল বসু এই শ্রেণির চরিত্রগুলিকেও তাঁর প্রহসনে স্থান দিয়েছেন। তাদের হীন মানসিকতা ও সুবিধাবাদী চিন্তাভাবনা পাঠকদের মনে একপ্রকার ঘৃণার ভাব সৃষ্টি করেছে। 'সাবাস বাঙালী' শুধুমাত্র একটি প্রহসন নয়, এটি স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাঙালি সমাজ এবং সাধারণ মানুষকে নাট্যকার যেভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তারই জীবন্ত চিত্র বলা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র:

১. বসু, অমৃতলাল। সাবাস বাঙালী। কিশোর প্রীন্টিং ওয়ার্কাস্, কলকাতা, ১৩১২।
২. সেন, সুকুমার। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড)। আনন্দ পাবলিশার্স, সপ্তম মুদ্রণ- ১৪১৬ পৃ. ৩৫৬-৩৫৬।
৩. ঘোষ, তুষার কান্তি। স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য। পৃ. ৩০১।
৪. বসু, অমৃতলাল। সাবাস বাঙালী। কিশোর প্রীন্টিং ওয়ার্কাস্, কলকাতা, ১৩১২, পৃ. ১৩।
৫. তদেব, পৃ. ২৭।
৬. তদেব, পৃ. ৩৯।
৭. তদেব, পৃ. ১।
৮. তদেব, পৃ. ১।
৯. তদেব, পৃ. ১৮।
১০. তদেব, পৃ. ৩০।
১১. তদেব, পৃ. ৬০।
১২. তদেব, পৃ. ৬২।